ড. এ. কে. এনামুল হক

দায় ও দায়হীনতার অর্থনীতি

ভেবেছিলাম অন্য একটি বিষয়ে লিখব। কিন্তু তা হলো না। কারণ কভিড আক্রমণের দ্বিতীয় প্রবাহ বেগবান হচ্ছে। সরকার এরই মধ্যে লকডাউন/চলাচলে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ফল হয়েছে উল্টো। প্রথমত, লোকজন বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ছে। ফলে ঢাকার বিপদ সারা দেশে ছড়াবে। আর দ্বিতীয়ত, লোকজন দোকানপাটে হানা দিয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মজুদ করার জন্য। আগেও বলেছি, আবারো বলছি সাধারণ লকডাউন পৃথিবীর কোথাও কভিড সংক্রমণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত হয়নি। প্রায় ১৬৩ দেশের উপাত্ত নিয়ে আমরা একটি গবেষণা নিবন্ধেও তা দেখিয়েছি। স্থানীয় লকডাউন কিছুটা কার্যকর। তাই দেশব্যাপী লকডাউন অর্থহীন। তাতে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গরিব লোকজন যারা সঞ্চয়নির্ভর নয়, তাদের খাদ্যাভাব দেখা দেবে। বাজার সরবরাহের সঙ্গে দেশের অর্থনীতি জড়িত, তাই বাজার বন্ধ হয়ে গেলে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে। আমাদের নীতিপ্রণেতাদের প্রধান সমস্যা হলো তারা এক চোখে দেখেন। এই চোখে তারা কেবল নিজেদেরই দেখেন। সারা দেশ বা জনগণকে দেখেন না।

কভিড বৃদ্ধির কারণ যদি জনগণের অবাধ বিচরণ হয়ে থাকে, তবে ভেবে দেখুন এই বিচরণ বৃদ্ধির মূলে কারা। একটি উদাহরণ দিই। ঢাকার চিড়িয়াখানা বন্ধ হলো কিন্তু বইমেলা বন্ধ হলো না। কারণ? চিড়িয়াখানায় বড়লোকেরা ভ্রমণ করেন না। তারা যান সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানায়। আর বইমেলায় যান শিক্ষিতরা, সমাজে যারা ভাগ্যবান হিসেবে পরিচিত। তাদের মেলা খোলা কিন্তু গরিবদের মেলা বন্ধ! আবার ভাবুন জনসমাগম কোথায় বেশি হয়? বইমেলায় নাকি চিড়িয়াখানায়? সরকার বাসের আসন সংখ্যা অর্ধেক ঘোষণা করল অথচ ভাবল না বাসের বাকি অর্ধেক লোক কী করে অফিসে যাবে? একই সঙ্গে উবার বা পাঠাওর সেবা বন্ধ হলো। রাইড শেয়ার বন্ধ হলো। তাহলে বাসে ভিড় কি কমবে? অথচ বাস ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে বাস ভাড়া বৃদ্ধি করা হলো। যেকোনো নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে না পারাটা একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা। তাতে সরকারের ওজন কমে। সরকারকে তুচ্ছজ্ঞান করবে জনগণ। কথায় বলে, ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।

যে কারণে জনসমাগম বেড়েছিল, তার কারণ কী? সেখানে হস্তক্ষেপ না করে জনগণকে বাস ভাড়া বাড়িয়ে দিয়ে কি থামানো যায়? তাতে হিতে বিপরীত হয়। অফিসগুলো কি অর্ধেক জনবলে চলছিল? নিশ্চয়ই না। কভিডের প্রথম প্রবাহের মাত্রা কমতেই আমরা অফিসগুলো তরতর করে খুলে ফেললাম। যারা করল তাদের শাস্তি দিন। জরিমানা করুন। দেখবেন যারা ঘোষণা দিচ্ছেন, তাদের ঘাড়েই পড়বে শাস্তি। সম্ভবত বরিশালের একটি ঘটনা। এক ভ্রাম্যমাণ আদালতের খবর এসেছে। বিচারক দোকানিকে জরিমানা করেছেন দোকানে বেশি ক্রেতা দেখে। তাকে সালাম। সবাই মিলে কাজটি করুন। তাহলে দেখবেন জনসমাগম কমবে। এরই মধ্যে মেডিকেলে ভর্তির পরীক্ষা হলো। স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের নমুনাটা দেখার মতন। তাদের ভাষায়, পরীক্ষা হলে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। আহা, যেন পরীক্ষার্থীরা ড্রোনে করে পরীক্ষা হলে পৌঁছবে সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভাগীয় শহরে এবং সবার রয়েছে একটি করে বাংলো, যেখানে রাত কাটাবে! ফলাফল কী হয়েছে তা সবাই দেখেছে।

আমার এক ছাত্র র‍্যাবের কর্মকর্তা। তাকে জিজ্ঞেস করলাম কী অবস্থা। স্যার আমার ইউনিটে অনেকেই আক্রান্ত। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা তো মুখে মুখোশ আর আপাদমস্তক মুড়ে ঘুড়ে বেড়ান। তাদের চিন্তা কি। পুলিশ, বাস ড্রাইভার, র‍্যাব, বিজিবি কিংবা সাধারণ জনগণ তো রয়েছে। তারা ভাবেন অন্যরাও হয়তো তাদের মতনই ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তাঘাটে—আপাদমস্তক মুড়ে! কথাগুলো বলছি দুঃখের সঙ্গে। যে দেশে সাধারণ মানুষের ঘরে আলো-বাতাসের সংযোগ কম, যে দেশে শহরে মানুষের বাড়ি ভিনডর অন্ধকার থাকে, যে দেশে বহু মানুষের এখনো একটি কক্ষে দিনরাত যাপন করতে হয়, সেই দেশে লকডাউন হাস্যকর। তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না; বরং যে কারণে মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে, তার দিকটা ভাবুন।

কলকারখানার অধিকাংশ শ্রমিক বসবাস করেন এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে। তাদেরকে লকডাউনে এনে রাস্তায় মানুষ কমবে না। তাই ধন্যবাদ সরকারকে যে তারা কলকারখানাগুলোকে লকডাউনের আওতায় আনেনি। কৃষি খাতে লকডাউনের বালাই নেই। তবে তার পেকে যাওয়া পেঁপে বা পেয়ারা কি এক সপ্তাহ বসে থাকবে? নিশ্চয় নয়। তাই বাজার ব্যবস্থা বন্ধ রাখা সঠিক হবে না। রোজা আসছে। হিতে বিপরীত হবে। তাই বাজার থাকবে এর আওতামুক্ত। একবার গিয়েছিলাম পাইকারি বাজার দেখতে ঢাকার বাইরে। এক ক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বেচবেন এই পণ্য? আমি চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেব? নিজে যাবেন? না। তাহলে প্রকৃত ক্রেতা কে? তিনি চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ী। তার হয়ে আমি বাজারে পণ্য কিনি। কমিশন পাই। যোগাযোগ? মোবাইলে। পাইকারি বাজার ব্যবস্থায় রাস্তায় লোক সমাগম বৃদ্ধি পায় না। পণ্য সরবরাহ অটুট থাকে। কভিডের জন্য অনেকে বাজারের সময় সীমিত করেন। পণ্যের পরিমাণ কিংবা দোকানির সংখ্যা এক হলে সময় কমিয়ে দিয়ে কী করে ভিড় কমে, তা আমার মাথায় আসে না। আমার অংক বলে, তাতে ভিড় বাড়বে; বরং সময় বাড়ালে ভিড় কমতেও পারে। অথচ দেখুন আমাদের 'বিজ্ঞজনের' কাণ্ড! ব্যাংক ও বই মেলার সময় সীমিত করে দেয়া হয়েছে ভিড় কমানোর জন্য।

বাংলাদেশ ঢাকাভিত্তিক দেশ। যা কিছু দরকার, আপনাকে ঢাকায় আসতে হবে। কারো অসুস্থতা কি বসে থাকবে? হাসপাতালে রোগী থাকলে আত্মীয়স্বজন ছাড়া কি চলে? তাদের জন্য যাতায়াত চালু থাকবে বা থাকতে হবে। তাহলে লকডাউন কী? বলতে পারেন, বিনোদন, হোটেল, শপিং সেন্টার, স্কুল-কলেজ আর অফিস-আদালত মূলত রাস্তাঘাটে জনসমাগমের মূল কারণ। অফিসের কাজ বাড়ি থেকে করার নিয়ম কেন তুলে দিল সরকার? কেন আদালতপাড়ায় সব শুনানিই আদালতে উপস্থিত হয়েই করতে হচ্ছে? কেন সরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলো অনলাইনে থাকতে পারছে না? কেন মেলা হচ্ছে? কেন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পূর্ণোদ্যমে চলছে? সেদিন গিয়েছিলাম এক জানাজায়। নিকটাত্মীয় কভিডে মারা গেছেন। না গেলে চলে না। মসজিদে কোনো কভিড শব্দ নেই। দূরত্ব শূন্য। উপরন্তু, ইমাম সাহেবের মোনাজাত শুনে বেকুব বনে গেলাম। তিনি বলছেন, 'কভিডে মৃত মানুষ বিনা বিচারে বেহেশত নসিব হয়। আল্লাহ যাহা করেন ভালোর জন্যই করেন।' সত্য-মিথ্যার তর্কে গেলাম না, তবে এ ফতোয়ার মর্মার্থ কী হতে পারে, একবার ভেবে দেখুন!

আমাদের দেশে সব শাস্তি কেবল গরিব ও অসহায়ের জন্য। রাস্তায় ধর্মঘট রিকশাওয়ালাকে প্রকাশ্যে অপদস্ত করা হয় টিভিতে—কেন মাস্ক পরলেন না? কিন্তু যেসব অফিসে সবাই দলবদ্ধভাবে আসেন, সেই অফিসের অধিকর্তাকে শাস্তির আওতায় আনছেন না কেন? তার দায়িত্বহীনতার জন্যই তো বাসে ভিড় বাড়ছে। তার জন্যই তো অর্থনীতি বিপর্যস্ত হচ্ছে। তার অবহেলার দায় দেশবাসী কেন নেবে? কেন তাদের অদূরদর্শিতার জন্য দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে? স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধানকে শাস্তি দিন। কেন তারা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না করে পরীক্ষা নিলেন? পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কি পরীক্ষার হলেই সীমিত? তাদের ব্যর্থতার দায় কেন দেশবাসী নেবে? আরো অনেকে আছেন, তাদের চিহ্নিত করুন। তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনুন। সাধারণ জনগণকে নয়। সাধারণ জনগণ এমনি এমনি বাসে ঝুলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিদিন অফিসে আসে না। বাসের ভাড়া বাড়িয়ে সাধারণ জনগণকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে আর বাস মালিকদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের পরীক্ষা কমিটির কাজে। যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলাম—পরীক্ষা চলছে? জি। যেতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু অনুরোধ করায় রাজি হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হয়ে আমি হতভম্ব। এত ছাত্র ক্যাম্পাসে কেন? উত্তর এল—পরীক্ষার জন্য। এরা ব্যাচ ব্যাচ করে পরীক্ষা দেবে। জানতে চাইলাম—তারা থাকে কোথায়? হল কি খোলা? না। তবে? খুব সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কী রকম? বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে কয়েকটি বহুতল ভবন রয়েছে, সেখানে ওরা ভাড়া থাকে। ওখানে থেকে ওরা পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবে। ক্যাম্পাসে নয়। হল খোলা নয় কেন? বুঝতেই পারছেন, কভিডের দায় বিশ্ববিদ্যালয় নিতে চায় না, তাই এ অবস্থা। ভাবলেন না, ও-রকম একটি স্থানে কি দূরত্ব বজায় থাকবে? পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কি থাকবে? উত্তর মেলেনি। তবে পাল্টা উত্তর এল, আমাদের এখানে কভিড নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন গত বছর পরীক্ষার পাঁয়তারা করছিল তখন এক বন্ধুবর অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কীভাবে ক্যাম্পাসে পরীক্ষা নেবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকে ভোলায়, পঞ্চগড়ে। তারা কী করে হলে না থেকে পরীক্ষা দেবে? অত্যন্ত গোছানো উত্তর পেলাম। আমরা তা ভেবেছি, পরীক্ষার সময় এমনভাবে করা হবে যেন ওরা বাড়ি থেকে এসে পরীক্ষা দিয়ে আবার বাড়ি ফিরে যায়। ঢাকায় থাকতে হবে না। আমার আক্কেল গুড়ুম। আপনি বলছেন, ভোলা থেকে রাতের বাসে এসে দিনে পরীক্ষা দিয়ে আবার রাতেই বাড়ি যাবে? অনেকটা ওই রকম! পথে ফেরি বন্ধ হলে কিংবা দুর্ঘটনা ঘটলে পরীক্ষার দায় কে নেবে? নিরুত্তর। শেষ পর্যন্ত তাদের অদূরদর্শিতার দায় নিতে হয়েছে সরকারকে। বাধ্য হয়ে বন্ধ করতে হয়েছে সবকিছু। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ কি দায় নিয়েছেন? অদূরদর্শিতার জন্য দুঃখ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি কেউ।

কভিডের যুগে অনেক দেশে সাইকেলের ব্যবহার বেড়েছে। কারণ সাইকেলে যাতায়াত করলে দূরত্ব বজায় থাকে। অনেক শহর জরুরি ভিত্তিতে সাইকেলের লেন চিহ্নিত করেছে। যাতে সাইকেল আরোহীরা অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন। এ সুযোগে ঢাকায় সাইকেল লেন চালু করুন। ইলেকট্রিক বাইকের প্রচলন বাড়ান। তবেই দেখবেন রাস্তার অনেক ভিড় কমে যাবে। তা না করে ইলেকট্রিক বাইককে তথাকথিত আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কী কারণ? আবছা আলোয় বুঝতে পারি এ দেশে আইনের আওতায় আনা মানেই বাড়তি কিছু সুবিধা আদায়ের ব্যবস্থা তৈরি করা। যে সংস্থা গাড়ির ফিটনেস কিংবা ড্রাইভারের লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ, তাদেরকে কেন নতুন দায়িত্ব দেবেন? মানুষের হয়রানি বাড়ানোর জন্য?

কভিড সংক্রমণ থেকে উত্তরণের দুটি স্পষ্ট উপায় রয়েছে। এক. সবাইকে টিকা নিশ্চিত করা। দুই. জনগণকে দূরত্ব, মাস্ক ও হাত ধোয়া নিশ্চিত করা। আমরা দুটোতেই ব্যর্থ। আমরা বুঝতে পারছি না কোন দিকে যাচ্ছি। সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা। যারা সাহস করে টিকা দিয়েছিলেন, তাদেরকে বলা হয়েছিল, তাদের দ্বিতীয় ডোজের টিকা মজুদ রেখেই নাকি বাকিদের দেয়া হচ্ছে। সেই মন্তব্যগুলো এখন কলছে যে না, তা হচ্ছে না। টিকার দ্বিতীয় মাত্রার পর্যাপ্ত মজুদ নেই। রাজনীতিকরা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেন জানতাম কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা তা করবেন কেন? সরকারি কর্মকর্তারা তাদের ভাষায় থাকবেন মার্জিত আর বচনে হবেন স্পষ্টভাষী। এটাই কাম্য।

এরই মধ্যে আমার এক ছাত্র পাঠাল গার্ডিয়ানের একটি প্রতিবেদন। জানাল, স্যার পড়ে দেখেন, টিকার কাহিনী। পড়ে আমিও অবাক। ফেব্রুয়ারিতে লিখেছিলাম যে আমাদের উচিত টিকা উৎপাদনের চুক্তি করা। বলেছিলাম পৃথিবীর একটি বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে আমাদের উচিত টিকা উৎপাদনের লাইসেন্স গ্রহণ করা। টিকার ফটকা কারবার করা আমাদের জন্য সঠিক হবে না। কারণ এত বড় দেশকে পর্যাপ্ত টিকা কেউ দিতে পারবে না। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন পড়ে ভিমড়ি খেলাম। টিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল টিকার বাজার দখলে উন্নত দেশগুলোর আত্মরক্ষার প্রতিযোগিতা ও কৌশল গ্রহণ। অত্যন্ত চতুর রাষ্ট্র যুক্তরাজ্য। তাদের আবিষ্কার অক্সফোর্ড টিকার বাজার রক্ষা করা প্রয়োজন। তাই তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো বড় উৎপাদনকারীদের সঙ্গে চুক্তি করা। পৃথিবীর বৃহত্তম দুটি টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের একটি ভারতে আর অন্যটি চীনে। চীন যেহেতু নিজেদের টিকা তৈরি করবে, তাই সুচতুরভাবে তারা ভারতের সিরাম কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এদিকে চীনের টিকারও তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা প্রয়োজন। এটি ছাড়া তাদের টিকা ডব্লিউএইচও ছাড়পত্র পাবে না। নিজের দেশে কভিড রোগীর সংখ্যা কমে গেছে। তাই তারা ব্যস্ত কোথায় টিকার তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা করা যায়? প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা শেষ হয়েছে চীনে। সাফল্যও অনেক। তারা খুঁজছে কোথায় যাওয়া যায়। বাংলাদেশকেও আহ্বান করেছিল। কিন্তু প্রথম প্রবাহে আমাদের কভিড আক্রান্তের সংখ্যা কম। তার ওপর অক্সফোর্ড ভারতের সিরামের সঙ্গে আগাম চুক্তি করে ফেলে। সরকার ও একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান টিকা আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে। তাই আমরা গা করিনি। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভারতেই টিকা উৎপাদন হবে। অতএব...।

অক্সফোর্ড ভারতকে দুটো টোপ দেয়। প্রথমত, টিকার উৎপাদন ভারত কেবল নিজেদের জন্য করবে না। পৃথিবীর ৯০টি দেশে টিকা প্রদানের জন্য তোমাদের লাইসেন্স দেয়া হবে। অর্থাৎ ৯০টি দেশের সব টিকা ভারতই উৎপাদন করবে। বিনিময়ে অক্সফোর্ডকে ভারতে টিকার পরীক্ষা করতে দিতে হবে। ভারত হবে গরিব দেশের টিকার জোগানদাতা। আর অ্যাস্ট্রাজেনেকা উৎপাদন করবে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের জন্য। এমন টোপ ফেলে দেয়া যায় না। সিরাম দায়িত্ব নেয়। বলা হয়, উৎপাদিত টিকার ৫০ শতাংশ থাকবে ভারতে, বাকিগুলো রফতানি হবে। আরো বলা হয়, যতদিন ডব্লিউএইচও কভিডকে আন্তর্জাতিক মহামারী হিসেবে স্বীকার করবে ততদিন টিকার মূল্য হবে নামমাত্র। অর্থাৎ ততদিন কোম্পানি লাভ করার উদ্দেশ্যে টিকা বাজারে ছাড়বে না। ছাড়বে মানবতার কল্যাণে। মহামারী কমে গেলে তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাজারে আসবে। এ পর্যন্ত সবই যেন গল্পের মতন। কোথাও খাদ নেই।

চালাকি করে তারা ভারতে চীনের বা রাশিয়ার টিকার তৃতীয় ধাপের পরীক্ষার পথ বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আরো ৯০টি দেশও যেহেতু ভারতের টিকা পাবে (বাংলাদেশসহ) তাই কেউই চীন বা রাশিয়ার টিকার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। বাজার থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণে। একই সঙ্গে পশ্চিমা মিডিয়ায় চলতে থাকল ব্যাপক প্রচার। টিকার গবেষণা নিবন্ধ জার্নালে প্রকাশের আগেই তাদের মিডিয়া তা প্রকাশ করতে লাগল। অনেকটা কোম্পানির মার্কেটিং কৌশল হিসেবে। চীন ও রাশিয়াকে বিশ্বাস করা যায় না। এমন সব তথ্য বাজারে ছাড়া হলো নানা সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে। আটকে গেল রাশিয়া ও চীন। তাদের টিকা পরীক্ষা করতেই কেউ রাজি নন। অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি। ব্রাজিলে চীনের টিকার পরীক্ষা হলো। তাদের পরীক্ষার ফলাফল এখন ডব্লিউএইচওর বিশ্লেষণে রয়েছে। তবে সেই সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে নতুন একটি বাজার কৌশল। এখন বলা হবে, ডব্লিউএইচওকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। ডব্লিউএইচও চীনের সহোদর। প্রচারের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিলেই চীন কুপোকাত হবে।

তবে টিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আড়ালে আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র তার জনগণের ৫০ শতাংশকে টিকা দিয়ে ফেলেছে। আগামী মে মাসের মধ্যে তারা ৯০ শতাংশ জনগণকে টিকার আওতায় আনবে বলে বাইডেন ঘোষণা করেছেন। ব্রিটিশরাও তা-ই। ইউরোপও তা-ই করেছে। অর্থাৎ উন্নত বিশ্ব টিকার মাধ্যমে মহামারী জিতে নেবে। রাশিয়া, চীন ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো মূলত নিজেদের মাস্ক, শারীরিক দূরত্ব ও হাত ধোয়ার মাধ্যমে কভিড মুক্ত করছে। তার ওপর তাদের হাতেও রয়েছে কার্যকর টিকা। অর্থাৎ আগামী জুলাই-আগস্টের মধ্যে বিশ্বের বৃহদাংশ কভিডমুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ ততদিনে আন্তর্জাতিক মহামারীর বর্তমান সাবধানবাণী আর থাকবে না।

বাকি রইল ভারত ও দক্ষিণ এশিয়াসহ সেই ৯০টি দেশ, যাদের টিকা জোগান দেয়ার কথা ভারতের। এরই মধ্যে উগান্ডা সরকার ভারতে টিকা না পেয়ে অক্সফোর্ডের টিকা কিনেছে ব্রিটেন থেকে তিন গুণ দামে। অন্যদিকে খোদ ভারতই ৩ শতাংশের কম জনগণ এ পর্যন্ত টিকা দিতে পেরেছে। গল্পের ক্লাইমেক্স এখানেই। ভারত নিজেই পারেনি তার জনগণকে টিকা সরবরাহ করতে। অথচ ৯০টি দেশ তার মুখাপেক্ষী! তাহলে কী হবে? ভারত তার নিজের দেশের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে টিকার প্রথমদিকের সব সরবরাহ নিজের জন্য যে রেখে দিতে পারে তা বলা বাহুল্য। তাছাড়া ততদিনে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে মহামারী থাকবে না। ডব্লিউএইচওর ওপর চাপ থাকবে তখন মহামারীর সতর্কতার মাত্রা নামিয়ে আনতে। তখন উন্নত দেশের সব টিকা বাজারে আসবে আমাদের জন্য। তবে হ্যাঁ, ডব্লিউএইচওর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী টিকা উৎপাদনকারী পশ্চিমা কোম্পানিগুলোকে তখন আর অলাভজনক মূল্যে তা বাজারে ছাড়তে হবে না। কেবল মহামারী সতর্কতা চলাকালীন কোম্পানিগুলো অলাভজনক মূল্যে তা সরকারকে সরবরাহ করবে বলে ডব্লিউএইচওর সঙ্গে চুক্তি করেছে। ফলে লাভ করেছে উন্নত দেশগুলো। তারা টিকা পেয়েছে অলাভজনক মূল্যে। আর অপেক্ষমাণ গরিব দেশগুলোর সময় যখন আসবে তখন তাদের সরকারকে আনতে হবে 'লাভজনক' দামে। তাও আনতে হবে উন্নত দেশ থেকে। কারণ ভারতের পক্ষে তা সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। আপনার কি মনে হয় না যে এ অংক আগে থাকতেই জানা ছিল কারো কারো?

গল্পের ভিলেন হবে ভারত। কারণ সে সময়মতো টিকা সরবরাহ করেনি। নায়ক হবে উন্নত দেশগুলো। তখন তারা তাদের আর্থিক ক্ষমতার বলে কোনো কোনো দেশকে 'দান' করবে কভিডের ওষুধ। মানবতার এমন উৎকর্ষ দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাবেন না। তবে অনুদান বা আনুকূল্য পাবে সেই সব দেশ, যারা পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষের শক্তি হিসেবে কাজ করবে। তাই বলি, এখনো সময় আছে, ১৭ কোটির দেশে টিকা নিজে উৎপাদনের জন্য এখনই ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ সামর্থ্য আমাদের অনেকদূর এগিয়ে নেবে। অক্সফোর্ড দেবে না। তাতে কী? সব দেশের টিকাই এক। একই ধরনের নিরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়। তাই আমাদের উচিত চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ সব দেশের টিকা উৎপাদনকারীদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যোগাযোগ করা। নচেৎ আগামী অর্থবছরে বিশ্ব অর্থনীতির কাটা যখন ঘুরে যাবে তখন যেন আমরা হোঁচট না খাই। তখনও যদি আমাদের অবস্থা আজকের মতো থাকে, তবে বিপদ আসবে চারদিক থেকে। টিকার ব্যবসায়ী-রা হয়তো বলবেন, 'আহা কি আনন্দ আজ আকাশে বাতাসে।' কিন্তু তাতে সরকারের লাভ হবে না। তাই দায়িত্বে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করার নিয়ম চালু করুন। আঙুল যদি তুলতেই হয়, তবে আমার অনুরোধ হবে আঙুল দায়িত্ববানদের দিকে তুলুন। তাদের ব্যর্থতার দায় যেন সরকারকে বহন করতে না হয়। সাধারণ জনগণ কিংবা অর্থনীতি যেন তাদের ব্যর্থতার বলি না হয়, সেদিকে নজর দিন।

ড. এ. কে. এনামুল হক: অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট

www.bonikbarta.net